বিতর্কিত জিএমও এবং বিটি বেগুনের বাস্তবতা

বার্তাপত্র

সেপ্টেম্বর-২০১৪

জিএমও প্রযুক্তি, সৃষ্টি ও বিবর্তন

জীব প্রযুক্তি (Biotechnology) বলতে উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা অনুজীবের মধ্যে ঐ জীব বা ঐ জীবের বুনো কোন প্রজাতি বা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অন্য কোন জীবের নতুন বৈশিষ্ট্য বা বংশগতির বাহক জিনের অনুপ্রবেশ ঘটানোকে বুঝানো হয়। এ প্রক্রিয়াকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকমবিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজি হিসেবেও অভিহিত করা হয়[১]। ১৯৭৩ সালে ষ্ট্যানলি কোহেন এবং হারবার্ট রয়ার এর সমন্বিত প্রচেষ্টায় গবেষণাগারে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে একটি জীবন্ত জীনের পুন:স্থাপন প্রক্রিয়ার যে প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব হয় তাই পরবর্তীকালে জিন প্রকৌশলবিদ্যা (Genetic Engieering) হিসাবে পরিচিতি লাভ করে[২]। আর এ প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত নতুন জীবকে কৌলিকগতভাবে পরিবর্তিত বা বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত জীব (Geneticaly Modified Organism) সংক্ষেপে জিএমও (GMO) বলা হয়।

আমরা জানি প্রতিটি উদ্ভিদের কোষে থাকে অসংখ্য ক্রোমোজোম। এদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না। এক জোড়া ক্রোমোজোম এক একটি বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং ক্রোমোজমের ভেতরে থাকে ডিএনএ (DNA) নামক মলিকুলার। মলিকুলারের সমন্বয়কেই জিন বলে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে ডিএনএ (যা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বহন করে) অর্থাৎ জিনের গঠন পরিবর্তন করে এক জটিল প্রক্রিয়ায় কাঙ্খিত উদ্ভিদের দেহে অন্য কোন প্রাণীর অথবা কোন ব্যাকটিরিয়ার ডিএনএ-এর অংশ বিশেষ (যা নির্দিষ্ট কোন বৈশিষ্ট্য বহন করে) ঢুকিয়ে দিয়ে রূপান্তরের মাধ্যমে জিএমও উদ্ভিদ বা শস্য তৈরি করা হয়। জিনের গঠনের এরূপ পরিবর্তনের ফলে জীবের আসল বৈশিষ্ট্য আর থাকে না এবং নতুন বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়[৩]।

জিএমও শস্যের বিভিন্ন ধাপ

প্রচলিত প্রজনন প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র একই প্রজাতি বা সমজাতীয় প্রজাতির মিলনেই নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। সেখানে নতুন প্রজন্মের মধ্যে উভয় জিনই থাকবে, এই জিনগুলো মূলত একই প্রজাতির গুণ বা বৈশিষ্ট্য বহন করে। অপরদিকে, একটি জিএমও সম্পূর্ণ নতুন গুণসম্পন্ন নতুন জিন ধারন করে। এক্ষেত্রে জিনের সমন্বয়টাও সম্পূর্ণ নতুন, ফলে উদ্ভিদসত্ত্বার নিজস্ব জিনের সাথে নতুন সঞ্চারিত জিনের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় অভাবিত। একটি কোষে জিন সঞ্চারণের মাধ্যমে সংকর জীবের (Transgenic) উদ্ভব হয় এবং এটি দিয়েই একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টি করা যায়। এই নতুন সৃষ্ট প্রজাতি জৈবিকভাবে খুবই নিম্নমান সম্পন্ন হয়।

জিএমও প্রবর্তনকে শস্য বা বীজের ক্ষেত্রে তিনটি জেনারেশনে ভাগ করা হয়েছে-

জেনারেশন-১:

জেনারেশন-১ এ পর্যায়ে জিএমও বীজে এমন বৈশিষ্ট্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন জিএমও গাছ ক্ষতিকর আগাছা সহনশীল ও কোন নির্দিষ্ট পোকা-মাকড় প্রতিরোধক্ষম হয় এবং নির্দিষ্ট কীটনাশকের প্রতি সাড়া প্রদান করে। এ জেনারেশন মূলত দু'ধরনের শস্য প্রবর্তনের জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে।

প্রথমত: জেনারেশন-১ এ প্রবর্তিত প্রথম ধরনের শস্য হলো হার্বিসাইড সহনশীল (Herbicide Tolerant) জাত। এসব জিএম শস্য অতিমাত্রায় প্রয়োগকৃত উদ্ভিদনাশক ও আগাছানাশক বিষাক্ততা সহনশীল হয়।

দ্বিতীয়ত: জেনারেশন-১ এ প্রবর্তিত দ্বিতীয় ধরনের জাত হলো কীটনাশক শস্য। এসব জিএম শস্য নিজেদের দেহে নিজেরাই কীটনাশক উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে চাষকৃত জিএম শস্যে কোম্পানির নির্দিষ্ট কীটনাশক প্রয়োগ করা হলে তা পাতা থেকে মূল পর্যন্ত প্রতিটি কোষে অনবরত কীটনাশক গুনাবলী উৎপাদন করতে থাকে। যেমন-বিটি ভূট্টা। এখানে বিটি কীটনাশক হিসেবে কাজ করে যা আসলে Bt (Bacillus thuringiensis) ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপাদিত বিষ। কিছু শস্য আছে যা একই সাথে উপরের দুটি কাজই করে। ১ম জেনারেশনের ৭% জিএম শস্য এরকম।

জেনারেশন-২:

জেনারেশন-২ এ শস্যকে এমন বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে যার মাধ্যমে পচনশীলতা রোধ করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের খরচ কমানো যায়। কৃষিতে বায়োটেকনোলজির দ্বিতীয় জেনারেশনের প্রথম দিকের দুটি শস্য হলো ক্যালজিনস্ এবং ধীরে পচনশীল। যেমন-টমেটো (থেয়ার, ১৯৯৯)। এ জেনারেশনের পরবর্তী আরও একটি শস্য হলো উচ্চ তৈলসমৃদ্ধ, কম ফ্যাটযুক্ত সয়াবিন।

জেনারেশন-৩:

কৃষি বায়োটেকনোলজির তৃতীয় জেনারেশনে এমন খাদ্য প্রবর্তনের দাবি করা হচ্ছে যা একইসাথে ঔষধ ও খাদ্য হিসেবে কাজ করবে। এ জেনারেশনের অর্ন্তভুক্ত খাদ্য হলো ক্যান্সার প্রতিরোধী শাক-সবজি, কোলেস্টরল হ্রাসকারী দানা শস্য, অণুপুষ্টি ও ক্যারোটিন সংযোজিত শস্য ইত্যাদি। এদেরকে "ফাংশনাল ফুড" বলা হচ্ছে যেমন-গোল্ডেন রাইস[৪]।

১. জীব নিরাপত্তা বুকলেট, পরিবেশ অধিদপ্তর, ২০০৬, Genetic Engieering, Recombinant DNA Technology
২. En.wikipedia.org/wiki/History-of-genetic-engineering
৩. National Consultations on Bt Brinjal, Centre for Environment Education, India, 2010, DNA-Deoxyribon Nucleic Acid
৪. Qaim Matin, 2003, *The Economices of Genetically Modified Crops*

জিএমও এর বিশ্ব চিত্র: পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

আশির দশকে জিএমও খাদ্যশস্যের নিম্নলিখিত কিছু বৈশিষ্ট্যকে উপলক্ষ্য করে জিএমও টেকনোলজি ব্যবহারে সমগ্র বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। যেমন বলা হয়-

- এতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে যা বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের সংস্থান করবে, ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে;
- এ প্রযুক্তি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করবে এবং অধিক উৎপাদন ক্ষমতার ফলে ভূমির অপচয় কম হবে; এতে কৃষক ও খাদ্য প্রস্তুতকারক ইন্ডাষ্ট্রিগুলো অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত হবে;
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুর্ধাত মানুষের সংখ্যা কমবে ও দারিদ্রতা হ্রাস পাবে, কেননা এ প্রযুক্তি ফসলের গুণাগুণকে বাড়িয়ে তুলবে যা পুষ্টিহীনতা ও অন্ধত্বের হাত হতে দরিদ্র জনগণকে মুক্তি দেবে;
- রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধি শস্যজাত উদ্ভাবিত হবে যা বাণিজ্যিকভিত্তিক ও লাভজনক হবে, কেননা এ প্রযুক্তিতে পোকামাকড় বিহীন ফসল উৎপাদিত হবে যা রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের ব্যবহারকে কমিয়ে আনবে;
- জলবায়ুর পরিবর্তনকে হ্রাস করবে এবং গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাবে[৫]।

১৯৮০ সালে ইউএস সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জিএমও প্যাটেন্ট করার অনুমতি পাওয়ার পরই বহুজাতিক কোম্পানিগুলো জিএমও গবেষণায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। বাণিজ্যিকভাবে জিএমও প্রথম উৎপাদন শুরু হয় ১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। মূলত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চীন এবং ভারত এই ছয়টি দেশেই জিন রূপান্তরিত খাদ্য যেমন-সয়াবিন, ভুট্টা, সুগার বীট, শশা, পেঁপে, আলু, ক্যানোলা, টমেটো ও ধান ইত্যাদির উৎপাদন এবং কেনা-বেচা শুরু হয়। ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে উৎপাদিত শস্যের প্রায় ৯% ছিল জিএমও শস্য। পরবর্তীতে অন্যান্য দেশ যেমন-প্যারাগুয়ে, ইন্দোনেশিয়া, কলম্বিয়ায় এসবের চাষ শুরু করে।

জিএমও উৎপাদনের পর থেকেই জিএমও'র বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে প্রচুর প্রচারণা শুরু হয়। ২০১১ সালে বীজের মালিকানা, উন্নয়ন এবং নতুন নতুন বায়োটিক শস্য আবিষ্কারে প্রায় ২৩৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ১০টি বহুজাতিক বীজ কোম্পানি[৬]। পাশাপাশি কৃষি বাজারে এসব কোম্পানি তাদের উৎপাদিত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বাণিজ্যও প্রসার করছে[৭]।

জিএম শস্য ক্ষুদ্র কৃষক ও পৃথিবীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কোন সুফল বয়ে না আনলেও উৎপাদনকারী বৃহৎ বীজ কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। মূলত জিএমও বীজ ও রাসায়নিক কৃষি কোম্পানির স্বার্থেই প্রবর্তন করা হয়েছে যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো হার্বিসাইড ও পেস্টিসাইড ব্যবসার প্রসার ঘটানো। নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় জিএমও টেকসই প্রযুক্তি না হওয়া সত্ত্বেও এ প্রযুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে শুধুমাত্র প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বিক্রয়কারক কোম্পানির স্বার্থে।

এখানে বিশেষ লক্ষ্যনীয় যে কোম্পানির উৎপাদিত এ জিএমও উন্নত বিশ্বে পশুখাদ্য এবং জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হলেও তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে তা মানব খাদ্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয়[৮]।

জিএমও শস্যের আবাদ ও উদ্বেগ

২০১৩ সালে ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) এর তথ্যানুযায়ী বিশ্বের প্রায় ২৭টি দেশ জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে জিএম শস্য চাষ করছে। ২০১২ সাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের ২৮টি দেশে জিএমও চাষ করা হলেও গত বছর মিশর জিএম শস্য চাষবাদ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। নিম্নে সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত বায়োটিক শস্যের তালিকা দেযা হলো[৯]-

ক্রমিক	দেশসমূহ	জমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)	বায়োটিক শস্যের নাম
১.	আমেরিকা	৭০.১	ভুট্টা, সয়াবিন, তুলা, ক্যানোলা, আখ, আলফালফা, পেঁপে
২.	ব্রাজিল	৪০.৩	সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা
৩.	আর্জেটিনা	২৪.৪	সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা
৪.	ইন্ডিয়া	১১.০	তুলা
৫.,	কানাডা	১০.৮	সয়াবিন, ভুট্টা, ক্যানোলা, আখ
৬.	চায়না	৪.২	তুলা, পেঁপে, পপলার, টমেটো, আখ
৭.	প্যারাগুয়ে	৩.৬	সয়াবিন, ভুট্টা, তুলা
৮.	দক্ষিণ আফ্রিকা	২.৯	তুলা
৯.	পাকিস্তান	২.৮	সয়াবিন, ভুট্টা
১০.	উরোগুয়ে	১.৫	সয়াবিন
১১.	লিবিয়া	১.০	ভুট্টা
১২.	ফিলিপাইনস	০.৮	তুলা, ক্যানোলা
১৩.	অস্ট্রেলিয়া	০.৬	তুলা
১৪.	বারকিনা ফাসো	০.৫	তুলা
১৫.	মিয়ানমার	০.৩	ভুট্টা
১৬.	স্পেন	০.১	সয়াবিন, তুলা

৫. Executive Summary, 2011, ISAAA Brief 43

৬. Monsanto (USA) , DuPont (Pioneer) (USA), Syngenta (Switzerland), Groupe Limagrain (France), Land O'Lakes/Winfield (USA), KWS AG (Germany), Bayer CropSci (Germany), Dow AgroSciences (USA), Sakata (Japan), DLF-Trifolium A/S (Denmark).

৭. Dano Neth, 2013, *GMOs: Science and Global Realities, Philipines.*

৮. www.dw.de/genetically-modified-food-to-fight-hunger/a-1, 201, November 21

৯. Source: Clive James, 2013, Executive Summary, ISAAA Brief.

ক্রমিক	দেশসমূহ	জমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)	বায়োটিক শস্যের নাম
১৭.	মেক্সিকো	০.১	সয়াবিন, ভুট্টা
১৮.	কলাম্বিয়া	০.১	ভুট্টা, তুলা
১৯.	সুদান	০.১	তুলা
২০	চিলি	০.১	সয়াবিন, ভুট্টা, ক্যানোলা
২১.	হুডুরাস	০.১	ভুট্টা
২২.	পর্তুগাল	০.১	ভুট্টা
২৩.	কিউবা	০.১	ভুট্টা
২৪.	সিজ রিপাবলিক	০.১	ভুট্টা
২৫.	কোস্টারিকা	০.১	সয়াবিন, তুলা
২৬.	সোমালিয়া	০.১	ভুট্টা
২৭.	স্লোভোকিয়া	০.১	ভুট্টা
	মোট	**১৭৫.২**	

ISAAA এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত বছরে সারা বিশ্বে প্রায় ১৭৫.২ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় জিএম শস্যের চাষ করা হয়েছে। এর মধ্যে আমেরিকায় ৭০.১ মিলিয়ন হেক্টর, ব্রাজিলে ৪০.৩ মিলিয়ন হেক্টর, আর্জেন্টিনায় ২৪.৪ মিলিয়ন হেক্টর, ভারতে ১১ মিলিয়ন হেক্টর, কানাডায় ১০.৮ মিলিয়ন হেক্টর এবং চীনে ৪.২ মিলিয়ন হেক্টর জিএমও উৎপাদিত হয়। শুধু আমেরিকাতেই বিশ্বের প্রায় ৪০% জিএম শস্য চাষ হয়[১০]।

বিশ্বে মূলত পাঁচ ধরনের জিএমও শস্যের চাষ করা হয়।[১১] এগুলো হলো-

বিশ্বের মোট জিএমও উৎপাদন এলাকা

শস্য	মোট এলাকা (%)
সয়াবিন	৪৭%
ভুট্টা	৩২%
তুলা	১৫%
ক্যানোলা	৫%
অন্যান্য	১%
মোট	**১০০%**

প্রারম্ভিক পর্যায়ে বৃহৎ কৃষিবাণিজ্য সংস্থাগুলো জিএমও খাদ্য এবং কৃষিজ দ্রব্যের অবাধ বাজার প্রবেশাধিকার পেলেও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় জিএমও খাদ্য গ্রহণে স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি উঠে আসায় বর্তমানে তা প্রবল বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। ফ্রেন্ডস অব দি আর্থের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, জিএমও শস্য দারিদ্র দূরীকরণ, বিশ্ব খাদ্য সংকট মোকাবিলা ও স্থিতিশীল কৃষিকাজে সাফল্য রাখার কথা বললেও আদতে কোন ভূমিকাই রাখতে পারছে না। উন্নত দেশগুলোতে বেশ কিছু অস্বাভাবিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির ঘটনা ঘটে গেলে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ১৯৯৮ সালে ইউরোপীয় বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত জিএমও খাদ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের স্থগিতাবস্থা আরোপ করে। একইসাথে যুক্তরাষ্ট্রসহ কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনার কৃষি পণ্য ইউরোপীয় বাজারে ঢুকতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। এ সময়ে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন জিএমও খাদ্য ও শস্যের বাঁধাহীন বাজার অনুপ্রেবেশের রোধে একটি আইনি কাঠামো তৈরি করে। এদিকে স্থগিতাবস্থা শেষ হবার মাত্র ছয় মাস আগে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের বিরূদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে। একইসাথে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের এই নিষেধাজ্ঞাকে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধিরা অবৈধ, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য অনিষ্টকর, জৈব প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে বাঁধা, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান খাদ্য ঘাটতিকে টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি নানাভাবে আখ্যায়িত করেছে[১২]। মূলত ১৯৯৮ সালের পর থেকে ইউরোপে কোন ধরনের জিএমও শস্য চাষ বা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি।

১৯৯৯ সালের জুনে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত ৫টি দেশ (ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রিস, ইটালি এবং লুক্সেমবার্গ) দাপ্তরিক আদেশের মাধ্যমে কার্যকরীভাবে জিএমও'র সকল ধরনের অনুমোদন স্থগিত করে এবং সমন্বিতভাবে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্তদেশগুলো মিলিতভাবে আইন প্রনয়ণ না করা পর্যন্ত এ স্থগিতাবস্থা বলবৎ থাকবে বলেও উল্লেখ করে। ২০০৩ সাল পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত ছিল এবং সে সময় আরো ১০টি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ এর অর্ন্তভুক্ত হয় ও একটি জিএম ফ্রি নেটওর্য়াক তৈরি করে[১৩]।

জনগণের মতামত ও অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে ২০০৩ এর শেষের দিকে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো মিলে জিএমও শস্য চাষ এবং জিএম খাদ্য হিসেবে আমদানির ক্ষেত্রে মানব ও পশুস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য কঠোর মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ, ঝুঁকি নিরূপণের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষণ নিশ্চিতকরণ, পূর্ব সর্তকতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি স্বচ্ছভাবে লেবেলিং বাধ্যতামূলক ও আন্তঃচলাচল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে বিধিবিধান (Regulation No-1829/2003) প্রনয়ন করে[১৪]। ফ্রেন্ডস অব দি আর্থ এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রায় ৯৪.৬% ইউরোপীয়ান খাদ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিজস্ব পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়, ৮৫.৯% জিএমও খাদ্য গ্রহণের পূর্বে তা নিরাপদ কিনা সে সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক এবং প্রায় ৭০.৯%ই এক কথায় জিএমও খাদ্য বর্জন করতে চায়[১৫]।

---

১০. Friends of the Earth International (FoEI) report, Who benefits from gm crops? April, 2014
১১. Dano Neth, 2013, *GMOs: Science and Global Realities,* Philipines.
১২. http://www.nepalnews.com.up/ktmpost/2003
১৩. Friends of the Earth, Genetically Modified Crops. A decade of failure (1994-2004) (Austria, Bulgaria, Cyprus, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Malta, Slovenia & Netherlands)
১৪. Eu/gmo/legislation, 2003
১৫. Friends of the Earth, Genetically Modified Crops, A decade of failure (1994-2004)

২০১৩ সালের নভেম্বরে ইউরোপীয়ান কমিশন নতুনভাবে জিএমও ভুট্টা অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনায় আনলে সেখানকার পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই এর বিরোধিতা করেন এবং একই বছরের ডিসেম্বরে ইউরোপীয়ান কোর্ট ইউরোপীয়ান কমিশনের জিএমও আলু অনুমোদনের সিদ্ধান্তও বাতিল করে দেয়। ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের ১৯টি দেশের মন্ত্রীগণ জিএমও শস্য অনুমোদন না দেয়ার পক্ষে ভোট দেয়।

জিএমও খাদ্যের বৈরী প্রভাব লক্ষ্য করে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের দেশে জিএমও খাদ্য প্রবেশের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠে। একারণেই জিএমও খাদ্যের উদ্ভাবকরা তাদের উৎপাদিত খাদ্যের অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোর সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সুদান, জাম্বিয়া, মোজাম্বিক ও জিম্বাবুয়ে এই চারটি দেশ আমেরিকার ক্রমাগত অনুরোধ সত্ত্বেও খাদ্য সাহায্য হিসেবে জিএমও শস্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। তাই জিএমও খাদ্য অনুমোদনের সাথে অর্থ সাহায্যের বিষয়টি যুক্ত করার ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগ নিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকার জাম্বিয়ায় দুর্ভিক্ষের সময় ৫১ মিলিয়ন ডলার অনুদান হিসেবে দিতে চেয়েছিল তবে শর্ত ছিল জিএমও ভুট্টা আমদানি করতে হবে। পরবর্তীতে জাম্বিয়া সরকার নিজের সার্বভৌম ক্ষমতার বলে জিএম খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়[১৬]। যদিও জাম্বিয়ার ত্রিশ লাখ নাগরিক অভুক্ত ছিলো, তবুও ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে এ দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া ১৮ হাজার টন খাদ্য সাহায্য ফেরত পাঠায়। জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, "আমি না খেয়ে মরবো, তবু কোন বিষাক্ত খাদ্য খাবো না।" বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফও) তথ্য অনুযায়ী- ভারত, কলম্বিয়া, গুয়েতেমালা, নিকারাগুয়ে, ইকোয়েডর এবং কিছু আফ্রিকার দেশের জন্য যে খাদ্য সাহায্য পাঠানো হয়েছে তাতে সাহায্য গ্রহীতার অজান্তেই জিএম খাদ্য অন্তর্ভুক্ত ছিলো[১৭]।

২০০০ সালের জানুয়ারিতে বিশ্বের ১৩০ দেশ মিলিত হয়ে জিএমও খাদ্যে লেবেলিং ব্যাপারে আর্ন্তজাতিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় সেখানে সবচেয়ে বেশি জিএমও উৎপাদনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্রও স্বাক্ষর করেছিল[১৮]। পরবর্তীতে ২০০১ সালের ২৮ জুলাই ওয়াশিংটন পোষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা (ইপিএ) জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন খাদ্যশস্যকে মানব খাদ্য হিসেবে অনুপযোগী বলে চিহ্নিত করেছে। জিএমও উৎপাদনকারী আমেরিকার সর্ববৃহৎ কোম্পানি মনসান্টোর এক মামলায়(মনসান্টো বনাম গিরটসন সিড ফার্মস, ২০০৭) ইউএস ফেডারেল কোর্ট মনসান্টোর উৎপাদিত জিএমও আলফালফা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করেছে। কেননা এক্ষেত্রে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মনসান্টো কোন ধরনের পরিবেশগত প্রভাব বিষয়ক গবেষণা করেনি। একইভাবে ২০০৬ সালে চালে জেনেটিক সংমিশ্রণ থাকতে পারে বিধায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইউরোপে চাল রপ্তানী ব্যাহত হয়[১৯]।

২০০৮ সালের তথ্যানুযায়ী ইটালির প্রায় ১৬টি প্রদেশে জিএমও খাদ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাপানের কৃষি মন্ত্রণালয় তাদের দেশে অনুমোদিত জিএমও শস্য মানব দেহের জন্য তো বটেই এমনকি পশুখাদ্য হিসেবেও নিষিদ্ধ করেছে। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া ও তাসমানিয়া সকল প্রকার জিএমও খাদ্যের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তার সময়কাল বাড়িয়ে ২০১৯ সাল পর্যন্ত করেছে। ২০১২ সালে ইকোয়েডোরের প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত জোড়ালোভাবে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় জিএমও শস্য চাষ স্থগিত করে দিয়েছিলেন[২০]।

এছাড়া ডেনিশ সরকার জিএমও শস্য চাষের ফলে যেসব কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করে ক্ষতিপূরণ দিতে একটি আইন অনুমোদন দিয়েছে এবং জিএমও শস্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে এ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বলা হয়েছে[২১]।

২০১১ সালের নভেম্বরে বিশ্বের পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো মনসান্টো বীজ কোম্পানিকে জানিয়েছে যে, জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা যে বিটি ভুট্টা তৈরি করেছে তা চাষের ক্ষেত্রে গাছের শিকরে এক ধরনের কৃমির উদ্ভব করে যা কোন ধরনের কীটনাশক দ্বারাই প্রতিহত করা সম্ভব নয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছে যে, আমেরিকায় ভুট্টা চাষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এ কৃমি। কৃমির কীটনাশক প্রতিরোধ ক্ষমতা এতোই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে আর কোন ধরনের কীটনাশক দ্বারাই তাদের প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। শুধু তাই নয়, সেখানকার জিএমও শস্য ক্ষেতে স্বাভাবিকের তুলনায় আগাছা অত্যাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ফলে সাধারণ শস্যের তুলনায় জিএমও শস্যে ২৫% বেশি পরিমাণে আগাছানাশক ব্যবহার করতে হয়েছিল। আমেরিকায় জিএমও শস্য ক্ষেতে আর্শ্চযজনকভাবে শস্যের তুলনায় সুপার উইড (Supper weed) বা আগাছা ১০ গুণ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল[২২]। গত বছর পর্যন্ত মনসান্টো জিএমও শস্য উৎপাদন ও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ নিরাপদ বলে যে মিথ্যাচার করেছে, সে ধরনের মিথ্যা ধোকাবাজির বিরুদ্ধে সমগ্রবিশ্বের তৃণমূল সমাজ ও জনগণ এতো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল যে আমেরিকা ও ব্রাজিলের মতো জিএমও উৎপাদনকারী দেশ থেকে মনসান্টোকে পিছু হটতে হয়েছে।

সেন্টার ফর ফুড সেফটি (সিএফএস) দ্বারা পরিচালিত এক গবেষণায় আর্ন্তজাতিক খাদ্য নীতিমালা অনুযায়ী ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, রাশিয়া, চায়না, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, তুর্কী এবং দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিশ্বের প্রায় ৬১টি দেশে জিএম খাদ্যে লেবেলিং বাধ্যতামূলক করার নির্দেশনা রয়েছে যাতে করে ভোক্তারা জিএমও

১৬. আখতার ফরিদা, ২০০৯, *বিকৃত বীজ*, উবীনিগ
১৭. ব্রিফিং পেপার, *জিএমও খাদ্য: জনস্বার্থে হুমকীস্বরূপ*, বেলা, ২০০৩
১৮. *Genetic Engineering for modern agriculture*, Daily Star.17/9/2011
১৯. Genetically Engineered Food Alet, 6/4/2013
২০. Friends of the Earth International (FoEI) report, *Who benefits from gm crops? An industry built on myths*, 2014
২১. *গোলাঘর*, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ভয়েজ- ২০০৬
২২. Dano Neth, 2013, *GMOs: Science and Global Realities,* Philipines.

খাদ্য বিষয়ে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। ২০০১ সালে আমেরিকার খাদ্য ও ড্রাগস প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান জিএমও খাদ্যের লেবেলিং সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন তৈরির প্রস্তাবনা করেছে যা নতুন কোন ধরনের জিএমও খাদ্যে এলার্জি জাতীয় কোন উপাদান ও টক্সিনের উপস্থিতির পরিমাণ সর্ম্পকে ধারনা দিবে[২৩]।

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়া জিএমও চাষ বন্ধের বিল পাশ করেছে। মনসান্টোর কাছে অপ্রত্যাশিত হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমেরিকার প্রায় ১২টি প্রদেশে জিএমও লেবেলিং এর ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়েছে এবং সেখানে মনসান্তোর পরীক্ষামূলক জিএমও গম চাষ এবং বাণিজ্যিককরণের বিষয়টি পুরোপুরিভাবে বাতিলের দাবি জানিয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে সেদেশের জনগণ। ইতোমধ্যে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়ও আমেরিকার গম আমদানি স্থগিত করেছে[২৪]।

ফিলিপাইনে জিএমও ভুট্টা চাষাবাদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পূর্বসর্তকতামূলক (Precautionary) ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় আশেপাশের ফসলি জমিগুলোতে নানাধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। ফলে সেখানকার কৃষক সংগঠনগুলো এর প্রতিবাদ জানায় এবং সে বছরে ফিলিপাইনে অর্ধেক ফলনই ছিল নিজেদের স্থানীয় শস্য হতে। পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে বিটি বেগুন চাষের ক্ষেত্রে সেখানকার প্রতিবাদী কৃষকেরা বিটি বেগুনের চারা তুলে ফেলে দেয়।

চিত্র-১: ফিলিপাইনের জিএমও শস্যক্ষেত হতে চারা গাছ তুলে ফেলছে সেখানকার প্রতিবাদী কৃষকেরা

ভারত ২০০২ এর নভেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঠানো খাদ্য সাহায্যের একটি চালান আটকে দেয় এবং এই চালানে কোন জিএমও শস্য নেই এই মর্মে লিখিত অঙ্গীকার চাওয়া হয়। ত্রাণকর্মীরা সেটা দিতে ব্যর্থ হলে ছয় মাসের অচলাবস্থার পর তারা সে চালান আবার ফেরত পাঠায়। সে সময়ের মধ্যে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কোন সয়া আটাও গ্রহণ করেনি।

ভারত সরকার কখনোই জিএমও খাদ্য বা শস্যের আমদানি অনুমোদন করেনি বলে দাবি করলেও ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশে ১৯৯৩ সাল হতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত প্রায় এক লাখেরও বেশি কৃষক জিএমও বিটি তুলা চাষ করে নিঃস্ব হয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৩ হতে ২০০৬ সাল পর্যন্ত আরো ১৬ হাজার কৃষকের আত্মাহুতির খবর পাওয়া গেছে। ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয়ও এ পরিসংখ্যান সর্মথন করেছে[২৫]। বিটি তুলা চাষের পূর্বে সে দেশের সরকার প্রচার করেছিল যে তুলা চাষের সংকটে সকল সমস্যার সমাধান দিবে এই বিটি তুলা। আরো বলা হয়েছিল যে এতে চাষের খরচ অনেক কম হবে, কীটনাশকের ব্যবহার কমবে, উৎপাদন দ্বিগুণ হবে এবং মুনাফাও দ্বিগুণ হবে। ফলে দারিদ্রতা থাকবে না কিন্তু বাস্তবে ফল হয়েছে তার উল্টো। বিটি তুলা চাষ পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা ভারত সরকার জনসম্মুখে প্রকাশ না করলেও বিটি তুলা চাষের জমিগুলোতে কোন ধরনের গবাদিপশু না চড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। প্রথম দু-এক বছর বিটি তুলার ফলন কিছুটা হলেও পরবর্তী বছরগুলোতে কৃষিজ উপাদান, উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারে গৃহীত ঋণের বোঝা পরিশোধ করতে না পেরে কৃষকেরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিল। ভারতের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাতে প্রকাশিত এক বার্তায় বলা হয়েছে যে, তুলা চাষীরা বিটি তুলা চাষে ঝুঁকে পড়ার পরেই গভীর সংকটে পতিত হয়েছে। ২০১১-১২ সালে কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা বিশেষত বিটি তুলা চাষীদের মধ্যে তীব্র ছিল। কীটনাশকের বর্ধিত মূল্যের কারণে তুলা চাষের খরচও তখন বেড়ে যায়[২৬]। পরবর্তীতে ২০১২ সালের ১০ আগষ্ট ভারতের নিউ দিল্লী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, কৃষি ও জিএমও শস্য সংক্রান্ত ভারতীয় লোকসভার স্থায়ী কমিটি সকল ধরনের জিএমও শস্যের মাঠ পরীক্ষা স্থগিত করেছে এবং এমন শস্যের উপর গবেষণা কঠোর আবদ্ধতার মধ্যে করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে। যুক্তিহিসেবে কমিটি ভারতীয় সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, মানবস্বাস্থ্য এবং গবাদিপশুর উপর এসব শস্যের স্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব, যথাযথ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর অভাব এবং শস্য অবমুক্তির পরবর্তী পর্যায়ের তদারকির অভাবের কথা উল্লেখ করেছে[২৭]।

---

২৩. www.ext.colostate.edu (Fact Sheet no. 9.371)
২৪. www.centerforfoodsafety.org, 2012
২৫. Monsanto, Cereal killer GM and agrarian sucides in India, 2007
২৬. Satheesh P. V, 2013, *Genetically Engineered Promises*, India
২৭. Satheesh P. V, 2013, *Genetically Engineered Promises*, India

জিএমও নিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজের আশঙ্কা

জিএমও সম্পর্কে যে সমস্ত ঝুঁকির কথা বিশেষ ভাবে বলা হয়ে থাকে তা হলো:

- জীববৈচিত্র্যের ওপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব;
- অন্যান্য প্রজাতির ওপর অনভিপ্রেত প্রভাব;
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর ঝুঁকিপূর্ণ প্রভাব;
- নিকটতম প্রজাতিতে জিন ফ্লো' র প্রভাব;
- পতঙ্গ প্রতিরোধক শস্যের উদ্ভব হওয়ায় জিএমওকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণের ফলে মানুষ এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠা;
- মানুষ এবং প্রাণীর প্রতি বিষাক্ত এবং এলার্জিজনিত সমস্যার উদ্ভব;
- আনাকাঙ্খিত এবং বিস্ময়কর (phenotypic) বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ;
- 'সুপার উইড' এবং 'সুপার ভাইরাস'-এর উদ্ভব;
- টেকসই প্রযুক্তি না হওয়ায় বারবার ফলনের ফলে জিএম বীজ দ্বারা নতুন ধরনের কীটনাশক প্রতিরোধী কীটের জন্ম।

জিএমও'র বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাবও পড়তে শুরু করেছে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন যে, মানবস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর জিএমও'র নানা ক্ষতিকর প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে।

জিএমও খাদ্য গ্রহণের ফলে মানব স্বাস্থ্যের যেসব ঝুঁকি রয়েছে সেগুলো হলো-

১) অনেক সময় খুব দ্রুত বিষক্রিয়া হতে পারে;

২) জিএমও শস্যের পরিবর্তনশীল জিন উদ্ভিদের দেহে এক ধরনের প্রোটিন তৈরি করে যা মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে এলার্জি দেখা দিতে পারে;

৩) জিএমও খাদ্য গ্রহণকারীর দেহে ক্যান্সারের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে পারে যা মানব দেহে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

জিএমও ফসলের অন্য জীব থেকে ঢোকানো জেনেটিক ইনফরমেশন ষ্টমাক (Information stomach) হজম করতে পারে না বা কখনো কখনো রক্তের মাধ্যমে সাধারণ ডিএনএ'র সঙ্গে মিলে যেতে পারে এবং আচরণের পরিবর্তন আনতে পারে। এর ফলে ব্রেষ্ট ক্যান্সার, প্রোষ্টেট ক্যান্সার এবং কোলন ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ বেড়ে যায়। এছাড়া সেক্স ক্রোমোজমে প্রভাব ফেলতে পারে এবং সেক্স ইনফার্টিলিটি বা বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে। শুধু তাই নয়, কোন কারণে যদি দেহের ডিএনএ অর্থাৎ নিউক্লিটাইড সিকুয়েন্সের কোনো এক বা একাধিক নিউক্লিটাইডের মিউটেশন ঘটে যায় তবে ঐ ডিএনএ খুব দ্রুত অস্বাভাবিক ক্যান্সার সেল তৈরি করতে থাকে। সাধারণত মানুষের দেহের রোধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্যান্সার সেলগুলোকে শনাক্ত করে এবং কোনো ধরনের ক্ষতি ছাড়াই ধ্বংস করে দেয়। যদি দেহের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয় বা ক্যান্সার সেল সংখ্যায় বেশি হয় তখন খুব দ্রুত ক্যান্সার বাড়তে থাকে। আর এ ধরনের মিউটেশন সাধারণত বিষাক্ত টক্সিক রাসায়নিক পদার্থ, বিভিন্ন প্রকার রেডিয়েশন (এক্স-রে, অতিবেগুনি-রে) বায়োলজিক্যাল কারণে হয়। আর এ বায়োলজিক্যাল কারণগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে জিএমও খাদ্য। জিএমও খাদ্য তৈরিতে সচরাচর কলিফ্লাওয়ার মোজাইক ভাইরাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন-বিটি-ভুট্টা, জিএমও তুলা ও ক্যানোলাতে কলিফ্লাওয়ার মোজাইক ভাইরাসের জীন ব্যবহার উল্লেখযোগ্য, যা অনেকাংশে হেপাটাইটিস-বি এবং এইচআইভি ভাইরাসের মতোই ভয়ংকর[২৮]।

জিএমও নিয়ন্ত্রণে আইন

১৯৯২ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য সনদ (সিবিডি) অনুমোদিত হয়। জিএমও প্রক্রিয়া এবং জীববৈচিত্র্যের উপর এর বিরূপ প্রভাব আর্ন্তজাতিক মহলের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় এ দলিলে জিএমও বিষয়ে সর্তকতামূলক নীতি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে[২৯]। এরই অধীনে ২০০০ সালে জৈব নিরাপত্তা বিষয়ে কার্টেহেনা প্রটোকল অন বায়োসেফটি প্রনীত হয়। এ প্রটোকলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জিএমও পণ্যের আন্ত:দেশীয় প্রবেশাধিকারের/চলাচলের ব্যাপারে তাদের উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেছে এবং এতে জিএমও খাদ্য গ্রহণে প্রত্যেক রাষ্ট্রের পছন্দনীয়তার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এখানে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের উপর নিয়ন্ত্রণহীন জৈবপ্রযুক্তির সম্ভাব্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। প্রটোকলের অনুচ্ছেদ ১৮(২) অনুসারে যে সমস্ত রূপান্তরিত প্রাণিসত্ত্বা (modified organism) সরাসরি মানুষের খাদ্য, প্রাণি খাদ্য হিসেবে বা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হবে সেগুলোতে 'রূপান্তরিত প্রাণিসত্ত্বা থাকতে পারে' (may contain living modified organism) এমন সনাক্তকারী চিহ্ন থাকা বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশ সরকার সিবিডির অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ কনভেনশন এবং কার্টাহেনা প্রটোকল মানতে বাধ্য। বাংলাদেশে ২০০৬ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় "পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা" প্রনয়ণ করে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে উৎপাদিত এবং বিদেশ হতে আমদানিকৃত উভয় প্রকার পণ্যের লেভেলিং সংক্রান্ত তথ্য নিশ্চিত করা যাতে করে পণ্যের অবাধ বাণিজ্যে স্বচ্ছতা এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ থাকে। এই নীতিমালার অধ্যায় ৪ অনুযায়ী জিএমও পদ্ধতিতে উৎপাদিত সকল পণ্যের লেবেলিং এ তা স্পষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে।

---

[২৯] Akter Asma, 2011, *GMO Brifing*, BELA

জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ধরনের কৌলিকগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি আমদানি, রপ্তানী, ক্রয়, বিক্রয় বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বিধি ৫ অনুযায়ী কৌলিকগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি বহনকারী মোড়কের উপর লেবেলিং থাকতে হবে এবং এই বিধান অন্য আইনের উপর প্রাধান্য পাবে। এখনও পর্যন্ত দেশে জিএমও খাদ্য আমদানির বিষয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণের কোন কার্যকর ব্যবস্থা না থাকলেও দেশে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি আইন, ১৯৫৭ এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অর্ডিন্যান্স (বিএসটিআই অধ্যাদেশ), ১৯৮৫[৩০] আইনগুলোর অধীনেও জিএমও খাদ্য শস্য ও খাদ্য দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এর ৩১ ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা তার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদন গ্রহণ না করে বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য[৩১] উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ, সরবারাহ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

বাংলাদেশে জিএমও শস্যের অনুপ্রবেশ

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও জিএমও নিয়ে বেশ আগে থেকেই তৎপরতা শুরু হয়েছিল। আমেরিকাভিত্তিক কর্পোরেট কোম্পানি মনসান্টো এবং বাংলাদেশের গ্রামীন ব্যাংকের মধ্যে ১৯৯৮ সালে প্রথম জিন প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত বীজ (জিএমও বীজ) কার্যক্রম নিয়ে একটি চুক্তি প্রকাশের পর পরই বিরোধীতার মুখে সেটি বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তীতে ২০০৩ সালে খাদ্য অপর্যাপ্ততা, পুষ্টিহীনতা ও দারিদ্রতা দূরীকরণের আশ্বাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যাশনাল কমিটি অন ক্রপ বায়োটেকনোলোজী (এনসিসিবি) কর্তৃক জিএমও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও গবেষণা শুরু হয়। জীব প্রযুক্তির কর্মকান্ড চালিয়ে নেয়ার জন্য গঠন করা হয় ন্যাশনাল টাস্কফোর্স অন বায়োটেকনোলজি (এনটিবি)। বহুজাতিক কোম্পানি সিনজেন্টার উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিরি) কে গোল্ডেন রাইস নিয়ে গবেষণার জন্য অনুমোদন দেয়। সে অনুসারে ধানের মধ্যে শীত প্রধান দেশের ডেফোডিল ফুলের জিন এবং ব্যাকটিরিয়ার জিন ঢুকিয়ে দিয়ে দাবি করা হয় যে এতে ধানের মধ্যে প্রো-ভিটামিন তৈরি হবে যা অপুষ্টির হার কমাবে এবং যারা যথেষ্ট পরিমানে শাকসবজি খায় না তাদেরকে রাতকানা রোগ থেকে মুক্তি দিবে। একইভাবে বেগুনের ভিতর ব্যাকটিরিয়ার জিন ঢুকিয়ে দিয়ে ফল ও ডগা ছিদ্রকারী (Fruit and Shoot Borer) পোকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধক হিসেবে বিটি বেগুন উদ্ভাবনের গবেষণা করতে দেয়া হয় বারিকে এবং বলা হয় এ বেগুন চাষে পোকার আক্রমণ হবে না তাই কীটনাশকের ব্যবহার কমবে। ফলে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, উৎপাদন বাড়বে এবং কৃষক লাভবান হবে। আলুর পচন রোগ বা লেট ব্লাইট রোগ নিয়ন্ত্রণে একটি স্থানীয় জাতের আলুর সাথে অন্য একটি বন্য আলুর জিন ও ছত্রাকের জিন ঢুকিয়ে দিয়ে জিএমও আলুর প্রচলনের জন্য বারিকে গবেষণা করতে দেয়া হয়। এছাড়া ধানকে লবণাক্ত ও ক্ষরা সহিষ্ণু করার জন্য ধানের মধ্যে ই-কলি ব্যাকটিরিয়া ঢুকিয়ে তার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করে জিএমও শস্যের প্রচলনে গবেষণা করতে দেয়া হয় বিরিকে[৩২]। এভাবেই জিএমও শস্যের গবেষণার তালিকা আরো দীর্ঘ হতে থাকে। গত বছর বারির অধীনে গবেষণারত জিএমও শস্য হিসেবে প্রথমবারের মতো বিটি বেগুনের ছাড় ও চাষাবাদের ক্ষেত্রে হঠাৎ করেই অনুমোদন চাইলে জিএমও শস্যের বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে।

জিএমও প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বন গবেষণা ইনিষ্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিরি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বারি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক) এবং কিছু এনজিও ও প্রাইভেট কোম্পানিকে সরাসরি নিযুক্ত করা হয়।

---

৩০. সিবিডি-এর অনুচ্ছেদ ১৮(ছ) অনুযায়ী, জৈব প্রযুক্তির মাধ্যমে রূপান্তরিত জীবিত উদ্ভিদ বা প্রাণীর ব্যবহার বা প্রকৃতিতে তাদের ছেড়ে দেয়ার ফলে সৃষ্ট বিরূপ পরিবেশগত প্রভাবের ফলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যে ঝুঁকি রয়েছে সেক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশ নিজস্ব পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে মানব স্বাস্থ্যের প্রতি এর ঝুঁকিও বিবেচনায় আনতে হবে।

৩১. Essential Commodities Act, 1957, Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985

৩২. বংশগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনকৃত বা সংশোধিত খাদ্য (Genetically Modified or Engineered Food)

বেগুন থেকে বিটি বেগুন

বিটি বেগুন নিয়ে আলোচনার আগে বেগুনের আদি নিবাস ও এলাকাভিত্তিক বিস্তার তুলে ধরা প্রয়োজন। বাংলাদেশ বেগুনের আদি উৎপত্তিস্থলের অন্যতম প্রধান অঞ্চল এবং হাজার হাজার বছর ধরে এদেশে বেগুনের চাষ হয়ে আসছে।

চিত্র-২ : বাংলাদেশে ১৮৮৪ সালে সর্বপ্রথম চৈতন্য নার্সারী নামক একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাগারে স্থানীয় বিভিন্ন জাতের বেগুন নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। তারও অনেক আগে থেকেই খনার বেগুন-বচন কৃষি সমাজে প্রচলিত ছিল- *"বলে গেছে বরাহের পো, দশটি মাসই বেগুন রো, ধরলে পোকা দিবি ছাই, এর চেয়ে ভালো উপায় নাই"*[৩৪]

আমাদের দেশে প্রধান তিনটি জনপ্রিয় সবজির একটি হলো বেগুন। ফ্রান্সের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ডি ক্যানডোল তাঁর অরিজিন অব কালটিভেটেড প্ল্যান্টস (১৮৮৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে প্রাচীন কাল থেকে বেগুন (Solanum melongena) প্রজাতি অবিভক্ত ভারতে পরিচিত। সে অর্থে বেগুন জন্মগতভাবে এশিয়া মহাদেশের একটি আদি প্রজাতি[৩৩]। রুশ বিজ্ঞানী ভ্যাভিলভ (১৯৫৪) এর মতে বেগুনের আদি উৎপত্তিস্থল ইন্দো-বার্মা অঞ্চল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন আকার, আকৃতি ও বর্ণের বেগুন পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে বেগুনের সর্বাধিক বৈচিত্র্য দেখা যায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারে।

বাংলাদেশে প্রায় ৪৮ জাতের বেগুন আছে যার প্রত্যেকটিরই রয়েছে আলাদা পুষ্টিগুণ। এসব প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বেগুন হিসেবে রয়েছে কুরুয়া বেগুন, জামালপুরী, গোল বেগুন, সবজে বেগুন, সিংগে বেগুন, লম্বা বেগুন, ফুলি বেগুন, মাকড়া বেগুন, মুক্তাকেশী, গৌরী কাজল ও রামঝুমকী বেগুন ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে শিংনাথ, খটখটিয়া, লম্বা, মোটা, তবলা, গোর, কালা, লতা, পুতা, সাদা, লাল, ঝুমকি, ডিম, তিতা, বারোমাইস্যা, কামরাঙ্গা, তাল, টুপরি, কুলি, টোপা, আউশা, হিংলা, ঘিকাঞ্চন, আমঝুপি, লেইট্যা, আউশা, বাতুলা, ভোলানাথ, কালোগোলা, শ্যামলা, হিংলা, সইলা, কাটা বেগুন এবং আদিবাসী অঞ্চলের বারেং মেকব্রেও, কামরাঙ্গা বারেং, খুমকা, বারেং দচি, বারেং মিগন ও টক স্বাদের নানা বেগুন। ২০০৯-১০ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে রবি এবং খরিফ মৌসুমে মোট ১,১৫,৪২৪ একর জমিতে ৩,৪১,২৬২ মেট্রিক টন বেগুন উৎপাদন হয়েছে। স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি দেশে-বিদেশে আমাদের দেশীয় বেগুনের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা।

আমাদের দেশের কৃষকরা নিজেদের জন্য এবং বিক্রির জন্য সাধারণত রবি ও বর্ষা মৌসুমে বেগুন চাষ করে থাকে। স্থানীয় জাতের অনেক বেগুনে পোকার আক্রমন কম হওয়ায় তেমন কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না। কোন কারণে পোকার আক্রমন দেখা দিলে দেশীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমনে করে থাকে। বারির নিজস্ব গবেষণা অনুযায়ী স্থানীয় বেগুন যেমন-ঝুমকো বেগুনে মাত্র ১%-১০%, খটখটিয়াতে ২০% এবং ইরি বেগুনে সর্বোচ্চ ৪০% পোকায় আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকার আক্রমণ রোধ করা সম্ভব যাতে কোন প্রকার স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ঝুঁকি নেই[৩৫]। তা সত্ত্বেও বারির মতো একটি দেশীয় বীজ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান জিএমও বেগুন উৎপাদনের নামে শুধুমাত্র বেগুনে ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা লাগা ও সেক্ষেত্রে কীটনাশকের ব্যবহারকে দোহাই দিয়ে পুরো গাছকেই বিষাক্ত করে ফেলার এক ভয়াবহ খেলায় মেতে উঠেছে।

বাংলাদেশের খ্যাতিনামা বিজ্ঞানী ড. রেজাউল করিম তাঁর গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, সারা দেশে ৫০,০০০ হেক্টর জমিতে বেগুন উৎপাদিত হয়। সরকারি হিসাব মতে, ৫০,০০০ হেক্টর জমিতে ৮২৩ টন বেগুনের চাষ করা হয়। সেই মোতাবেক শুধমাত্র ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকারোধে মাত্র ৮২ টন কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে পারবে এই বিটি বেগুন যা অত্যন্ত নগণ্য। জানা মতে বেগুনে ৭ ধরনের পোকা আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকা (এফএসবি) দমনের মাধ্যমে কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে আনবে বলে যে যুক্তি দেয়া হচ্ছে তা সঠিক নয়। কেননা অন্যান্য পোকা দমনে বিটি বেগুন কোন ভূমিকা রাখবে না। বরং এই বিটি বেগুন নানা ধরনের সংক্রামণ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ঝুঁকির সম্ভাবনা তৈরি করবে যার ভয়াবহতা হতে পারে অকল্পনীয়।

---

৩৩. সিবিডির অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী, 'জৈবিক সম্পদের আদি রাষ্ট্র' (Country of origin of genetic resources) বলতে সেই রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে ইন-সিটু অবস্থায় ঐ সম্পদ রয়েছে।

৩৪. পার্থ পাভেল, মে, ২০১৪, *বেগুনগিরি*, www.newsnextbd.com

৩৫. Integrated Pest Management বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হলো আন্তর্জাতিকভাবে সমর্থিত এক ধরনের প্রতিবেশ উপযোগী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশসম্মতভাবে কার্যকরী ও নিরাপদ।

বিটি বেগুনের আদ্যপান্ত

১৯১১ সালে সর্ব প্রথম জার্মান বিজ্ঞানী আর্নস্ট বার্লিনার আবিষ্কার করেন যে, Bt (Bacillus thuringiensis) নামক ব্যাকটেরিয়ার crystal জিন এক ধরনের মথ পোকা দমনে সহায়ক এবং সে সময় থেকেই ফ্রান্সে প্রথম স্পোরাইন (Sporine) নামক কীটনাশক হিসেবে এই বিটি ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে হেননি, ফিটস-জেমস এবং আনগাছ নামক আমেরিকান গবেষকগণ গবেষণার মাধ্যমে দেখেন যে, লেপিডোপটেরা (Lepidoptera) গোত্রের মথ পোকা নিধন করতে বিটি ব্যাকটিরিয়ার crystal জিন কীটনাশক হিসেবে কার্যকরী। ১৯৫৮ সালে আমেরিকায় এই বিটির বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয় এবং ১৯৬১ সাল থেকে সেখানে নিবন্ধিত কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে[৩৬]। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক বীজ কোম্পানী মনসান্টো ১৯৯৬ সালে বিটির প্যাটেন্ট নিয়ে লেপিডোপটেরা (Lepidoptera) এবং কলিওপটেরা (Coleoptera) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত শস্য ছিদ্রকারী পোকার বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য ভুট্টা, আলু, তুলা এই তিনটি শস্যের ভেতর বিটি জিন ঢুকিয়ে জেনেটিক্যালি মোডিফাইড (GM) শস্যের প্রচলন করে ব্যবহার করে। ভুট্টা, আলু ও তুলার পর বেগুনে এ বিটি জিন প্রবেশ করিয়ে বিটি বেগুন প্রচলনের জন্য কাজ শুরু করে।

সূত্র: GMOs: Science and Global Realities, Neth Dano, Philipines, 2013

চিত্র-৩: বিটি বেগুন গাছের যেকোন অংশ খেলেই ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা মারা যাবে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি, দাতাসংস্থা ইউএসএইআইডের সহায়তায় ত্রিদেশীয় (ভারত, ফিলিপাইন ও বাংলাদেশ) "কৃষি প্রাণ প্রযুক্তি সহায়তা প্রকল্প-২ (ABSP -II)" নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে বেগুনের ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকার বিরুদ্ধে কাজ করবে এমন বিটি বেগুন প্রচলনের জন্য মনসান্টো কোম্পানি ও মহারাষ্ট্র হাইব্রিড সীড কোম্পানি লিমিটেড (মাহিকো) কোম্পানি চুক্তি বদ্ধ হয়। চুক্তি অনুযায়ী এ প্রকল্পের ৭২% অংশীদার হলো বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টো এবং ২৬% অংশীদার ভারতের মাহিকো (Mahyco) কোম্পানি।

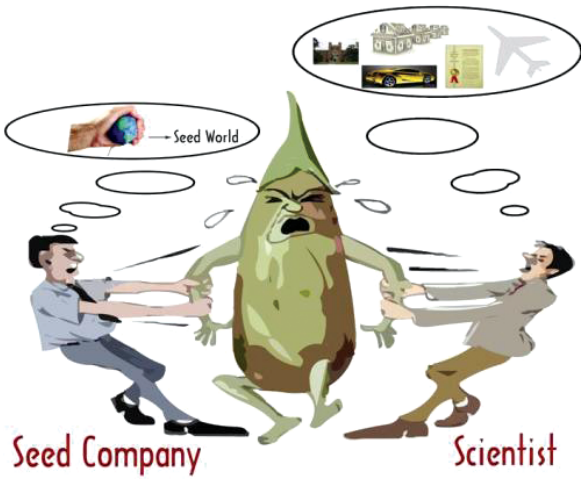

সূত্র: Natural Resource Management Center, India

চিত্র - ৪: বেগুন তুমি কার ???

এ চুক্তির ভিত্তিতে ২০০৫ সালে ভারতের বেগুনে মনসান্টোর বিটি জিন প্রতিস্থাপন করে বিটি বেগুনের প্রচলন করার জন্য ভারতের মাহিকো কোম্পানি, সাতগুরু কনসালটেন্টস (কর্নেল ইউনিভারসিটি ও ইউএসএআইডির প্রতিনিধি), ভারতের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়-কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, ধাওয়াদ, কর্নাটক ও তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কোয়াইম বাটোর, ভারত, ইন্সিটিটিউট অব ভেজিটেবলস রিসার্চ (উত্তর প্রদেশ, ভারত) সকলে একত্রে কাজ করে। চুক্তির ভাষ্য অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষকদের আর্থিক সহায়তা ও কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস করতে এ বিটি বেগুনের গবেষণা করা হবে। গবেষণার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ২০০৯ সালের ১৪ অক্টোবর ভারতের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এপ্রুভাল কমিটি (জিইএসি) দ্বারা পরীক্ষামূলক চাষের অনুমোদন পেয়ে মাহিকো কোম্পানি ভারতের কয়েকটি প্রদেশে জনসম্মতি ছাড়া, কোন ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ছাড়া মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ক্ষতি নিরূপণ না করে বিটি বেগুন এর মাঠ পর্যায়ে (Field Trail) গবেষণামূলক চাষ শুরু করে[৩৭]।

জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশটিকে জিএমও দূষণ হতে রক্ষা করার জন্য ভারতের পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো আন্দোলন শুরু করে এবং বহুজাতিক কোম্পানি মনসান্টো ও ভারতের মাহিকো কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পরবর্তীতে ভারতের পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রামেশ বিটি বেগুন মাঠ পর্যায়ে চাষের ক্ষেত্রে ভারতের বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তার প্রশ্নে মতবিরোধ থাকায় এবং পরিবেশবাদীদের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে মতবিনিময় করতে বাধ্য হন এবং বিটি বেগুন চাষের অনুমোদনের ছাড়পত্র বাতিল করেন। ২০১০ সালের

৩৬. www.history of bt (Bacillus thuringiensis)

৩৭. Friends of the Earth , report, Who benefits from gm crops? An industry built on myths, 2014

ফেব্রুয়ারীতে বিটি বেগুনসহ সব ধরনের জিএমও শস্যের মাঠ পর্যায়ের গবেষণামূলক চাষাবাদের উপর ভারতের সুপ্রীম কোর্ট স্থগিতাবস্থা জারি করে। স্থগিতাবস্থা থাকাকালীন সময়ে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা নিযুক্ত কারিগরী বিশেষজ্ঞ কমিটি ২০১৩ সালে বিটি বেগুন চাষ ও খাদ্য হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ সে বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞ কমিটি ভারতে পর্যাপ্ত গবেষণার মাধ্যমে বিটি বেগুন যে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ তা প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাবস্থা বলবৎ রাখার অনুরোধ জানায়। কমিটি আরো উল্লেখ করে যে বেগুন ভারতের আদি খাদ্যশস্য হওয়ায় সেখানে কোনভাবেই জিএমও শস্য (বিটি বেগুন) চাষ করা সমীচীন হবে না[৩৮]।

ভারতে ব্যর্থ হয়ে বিটি বেগুন গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান মাহিকো-মনসান্টো ২০১২ সালে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ফিলিপাইনে বিটি বেগুনের বাণিজ্যিক চাষাবাদের ক্ষেত্র তৈরি করতে উদ্যোগী হয়। এখানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি, ইউএসএইডের সহায়তায় মাহিকো হাইব্রিড সীড কোম্পানি এবং ফিলিপাইনের লস ব্যানোস ইউনিভার্সিটির (ইউপিএলবি) (University of the Philippines los Banos (UPLB) মধ্যে বিটি বেগুনের গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ২০১৩ সালের মে মাসে ফিলিপাইনে আর্ন্তজাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিনপীস, Magsasaka at Siyentipiko sa Pagpapaunlad ng Agrikultura (MASIPAG) নামক একটি স্থানীয় সংগঠন এবং অন্যান্যরা মিলিতভাবে বিটি বেগুনের মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলক চাষের অনুমোদনের বিরুদ্ধে একটি আবেদন করলে ফিলিপাইনের আদালত বিটি বেগুনের (যা ফিলিপাইনে বিটি ট্যালং নামে পরিচিত) মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলক চাষ স্থায়ীভাবে বন্ধ করার এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেন[৩৯]। ভারত ও ফিলিপাইনে বিটি বেগুন চাষে ব্যর্থ হয়ে উদ্যোক্তাগণ বিটি বেগুনের বাণিজ্যিক চাষের জন্য শেষ ভরসা হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নেয় এবং সরকারের অসর্তকতা ও দুর্নীতিপরায়ণতাকে কাজে লাগিয়ে প্রাথমিক সফলতাও পায় যার বিস্তারিত নীচে দেয়া হলো।

বিটি বেগুনের অনুমোদন:

ফল ও ডগা ছিদ্রকারী পোকার কারণে প্রতি বছর বেগুনের আশানুরূপ ফলন না হওয়া এবং পোকা রোধে অধিক কীটনাশক ব্যবহারের যুক্তি দেখিয়ে বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় নয়টি প্রসিদ্ধ জাতের বেগুনের জিন সিকোয়েন্স পরিবর্তন করে মনসান্টোর বিটি জিন প্রতিস্থাপন করার জন্য ভারতীয় বীজ কোম্পানি মাহিকোকে তার নিজস্ব গবেষণাগারে গবেষণা করতে দেয়[৪০]। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটি, দাতাসংস্থা ইউএসএইডের সহায়তায় মাহিকো হাইব্রিড সীড কোম্পানি, সাতগুরু ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট সেন্টার এবং বারির মধ্যে ১৪ মার্চ, ২০০৫ তারিখে "কৃষি প্রাণ প্রযুক্তি সহায়তা প্রকল্প-২ (ABSP -II)" এর অধীনে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে একটি ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছিল না বলে বারির মহাপরিচালক গত ৭ সেপ্টেম্বর, ১৪ তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেন। বারির বক্তব্য, বিটি জিন প্রতিস্থাপন করা এ বেগুনে পোকার আক্রমণ হবে না, তাই কীটনাশকের ব্যবহার কমবে, কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবে এবং উৎপাদন বাড়বে।

চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের উত্তরা (ইসি ৫৪৯৪০৯), কাজলা (ইসি ৫৪৯৪১০), নয়নতারা (ইসি ৫৪৯৪১১), শিংনাথ (ইসি ৫৪৯৪১২), দোজাহারী (ইসি ৫৪৯৪১৩), চ্যাগা (ইসি ৫৪৯৪১৪), খটখটিয়া (ইসি ৫৪৯৪১৫), ইসলামপুরী (ইসি ৫৪৯৪১৬), ঈশ্বরদী লোকাল (ইসি ৫৪৯৪১৭) এই নয়টি স্থানীয় বেগুনের জাতকে বিটি বেগুনে রূপান্তরিত করে মাঠ পর্যায়ে গবেষণার জন্য চুক্তি হয়।

চুক্তির ১.১৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিটি বেগুন প্রকল্পের বিটি জিন ও প্রযুক্তির প্রচলন, মেধাস্বত্ব ও নিয়ন্ত্রণ থাকবে মনসান্টো কোম্পানির। চুক্তির ৯.২(গ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জিনের ও প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ও মেধাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষিত না হলে কোম্পানি এ চুক্তি বাতিলের অধিকার রাখে। চুক্তির ৯.৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চুক্তি বাতিলের সাথে সাথে বারিকে বাংলাদেশে এ বিটি বেগুনের বিতরণ বন্ধ করতে হবে এবং সমস্ত বীজ ধ্বংস করে ফেলতে হবে। বারিকে জিএমও বেগুনের সমস্ত জার্মপ্লাজম (Germplasm) কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ধ্বংস করতে হবে এবং ঐ প্রতিনিধি এ ব্যাপারে লিখিত প্রতিবেদন কোম্পানির কাছে জমা দিবে[৪১]।

এই চুক্তি অনুযায়ী বারি ২০০৪ সাল থেকে দেশের ৭টি স্থানে গবেষণা শুরু করে। পরবর্তীতে কাজলা (ইসি ৫৪৯৪১০), নয়নতারা (ইসি ৫৪৯৪১১), উত্তরা (ইসি ৫৪৯৪০৯), ঈশ্বরদী লোকাল (ইসি ৫৪৯৪১৭) এই চারটি প্রজাতির বিটি বেগুন রূপান্তরের আনুষ্ঠানিক পরীক্ষণ শেষে একটি নির্দিষ্ট এলাকার কিছু গবাদি পশু, মুরগি ও মাছকে সেই বিটি বেগুন খাওয়ানোর পর দাবি করা হয় যে, এ বিটি বেগুন পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই হুমকীস্বরূপ নয়[৪২]। সেসব গবাদি পশু, মুরগি ও মাছগুলোকে আদৌ কোন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল কিনা এবং বর্তমানে তারা কি অবস্থায় আছে তা জানা যায়নি। তা সত্ত্বেও বারির আগ্রহ ও উদ্যোগে জুলাই থেকে অক্টোবর, ২০১৩ পর্যন্ত মাত্র ৪ মাসে এ বেগুনের মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদের অনুমোদন প্রক্রিয়া তড়িঘড়ি করে সম্পন্ন করা হয়।

---

৩৮. Bt Brinjal: Introducing Genetically Modified Brinjal(Egg plant) in Bangladesh, (BDRC), 2009
৩৯. Philippines Court of Appeals issues writ against trials for Bt Brinjal, FnB news.com, May 25, 2013
৪০. www.absp2.net
৪১. Sublicense Agreement, Article 1.19, Article 9.2(c), Article 9.6, 14 March, 2005
৪২. http://gurumia.com/2010/GM-crops-are-being-experimented-in-bangladesh/

বারির ১৪ জুলাই, ২০১৩ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে বারি'র বায়োসেফটি কমিটি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক) এর বায়োটেক কোর কমিটি বিটি বেগুন ১, ২, ৩ ও ৪ নামের জাতগুলোর অবমুক্তকরণের জন্য সুপারিশ করে। পরবর্তীতে জাতগুলো অবমুক্তকরণের প্রস্তাব কৃষিমন্ত্রণালয়ের (এনসিসিবি) তে উপস্থাপিত হলে কমিটি ৭ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে জাতগুলো অবমুক্তকরণের সুপারিশ করে। এর ঠিক একদিন পওে অর্থাৎ ৯ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় বিটি বেগুন অবমুক্তকরণের সুপারিশ অনুমোদন করতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানায়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে এক পত্রের মাধ্যমে পরিবেশ অধিদপ্তরকে ২৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের মধ্যে বায়োসেফটি কোর কমিটির (বিসিসি) সভা আহবান করে কমিটির মতামত/প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে অনুরোধ করে। ২৩ অক্টোবর বিসিসির সভায় অনুমোদন প্রক্রিয়া ও গবেষণার ঘাটতি বিষয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপিত হয়। যেমন- ***আবেদনপত্র পর্যালোচনার জন্য পর্যাপ্ত সময় না রাখা, on farm release এর ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে বসে পূর্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা, আবেদন পত্রের সাথে প্রেরিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি রেফারেন্স ও ক্রস রেফারেন্স না দেয়া ইত্যাদি।***

বিসিসির সদস্য সচিব অভিযোগ করেন যে, বায়োসেফটি গাইডলাইন অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে চাষের অনুমতির অন্তত ৯০ দিন পূর্বে আবেদনপত্র এনসিবি বরাবরে দাখিল করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। আবেদনপত্রের সাথে প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর রেফারেন্স না থাকায় পর্যালোচনা করা সহজ ছিল না। বিসিসির মিটিংএ উপস্থিত সদস্যগণ পরিবেশগত নিরাপত্তা ও মানব স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে[৪৩] ঝুঁকি নিরূপণে বারির দাখিলকৃত সারমর্ম (Abstract) দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন না বলে অভিমত দেন। বিসিসির পরবর্তী ২৫ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখের মিটিংএ সদস্য সচিব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, বারির দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তা ও বিষাক্ততা সংক্রান্ত কোন পরীক্ষা বাংলাদেশে হয়নি এবং ভারত হতে প্রত্যাখাত পরীক্ষাগুলোই আবেদন পত্রের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে। সংকর প্রাবল্য (cross compatibility) হবে না বলে বারি যুক্তি দাঁড় করালেও এ বিষয়ে সদস্য সচিব উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বেগুন স্বপরাগায়ি উদ্ভিদ হলেও এর ২-৪২% আউট-ক্রস (out-cross) হয় বলে বারির দেয়া তথ্য সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ জীববৈচিত্র্য ও নন-বিটি বেগুনের উপর বিটি বেগুনের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে আশংকা ব্যক্ত করেন এবং বায়োসেফটি গাইডলাইন অনুযায়ী বিটি বেগুনের লেবেলিং এর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। একই সাথে বিশেষজ্ঞগণ বিটি বেগুন প্রয়োগকৃত ইঁদুর ও গরুর ওজন হ্রাসের বিষয়টি উল্লেখ করে আরো পরীক্ষা সম্পাদনের তাগিদ দেন।

বিসিসির এসব সকল উদ্বেগ ও আশংকা বারির কর্মকর্তাগণ কোন রকম যুক্তিগ্রাহ্য কারন ছাড়াই নাকচ করে দেন। বারির মহাপরিচালকের মতে, খাদ্য নিরাপত্তা এবং বিষাক্ততা সংক্রান্ত পরীক্ষা করার সুযোগ বাংলাদেশে নেই বলে ভারত কর্তৃক প্রত্যাখাত রিপোর্টই বাংলাদেশে গ্রহণ করতে হবে। তার মতে জিএমও এর ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোন ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা কোথাও ঘটেনি।

বিসিসির সভায় বারি কর্তৃক সকল দলিল প্রদান সাপেক্ষে এবং পরিবেশ নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা দাখিলকৃত পরীক্ষা প্রতিবেদন এনসিবি কর্তৃক গৃহীত হলে বিটি বেগুনের ১,২,৩ ও ৪ জাতগুলো সীমিত পর্যায়ে অবমুক্তকরণ করা যায় বলে সুপারিশ গৃহীত হয়।

এনসিবি ২৭ ও ২৮ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে পর পর দুটি সভার আহবান করে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বিটি বেগুন সীমিত আকারে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে সভায় উপস্থিত এনসিবির সকল সদস্যগণই অনুমোদন প্রক্রিয়ার পর্যাপ্ততা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। এনসিবির সদস্য সচিব পূর্ব সর্তকতামূলক নীতি, পরিবেশগত নিরাপত্তা ও মানবস্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতি এবং জনমত যাচাই এর বিষয়ে গুরুত্ব দেন। এনসিবির কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে, পরিবেশগত নিরাপত্তা ও মানব স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে ঝুঁকি নিরূপণের তথ্যগুলো পর্যাপ্ত নয় এবং এক্ষেত্রে বারি কেবল ভারতের সম্পাদিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সারসংক্ষেপ দাখিল করেছে, পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন নয়।

সভায় এনআইবি'র মহাপরিচালক বিটি বেগুনের ক্ষেত্রে জিন-ফ্লোর গবেষণা এবং বিটি জিনের বাইরে টার্গেটেড পোকা প্রতিরোধে কোন বিকল্প দেশীয় জিন আছে কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন বলে মত দেন। বিটি বেগুনে যে জিনটি স্থানান্তরিত হয়েছে তার অনু বা আনবিক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত গবেষণা[৪৪] করাসহ অন্তত একটি PCR পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ মানব নিরাপত্তা বিষয়ে বারির ল্যাব বা অন্য কোন ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা জানতে চান। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, নতুন প্রোটিন খাবারে অর্ন্তভুক্ত হচ্ছে বিধায় বিটি বেগুনের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষনের উপর জোর দেয়ার পাশাপাশি কেন জিএমও বেগুন খেতে হবে তা বারির নিকট জানতে চান।

---

৪৩. যেকোন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ড্রাগ বা টক্সিন সমৃদ্ধ খাদ্যের রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের (Risk Assisment) জন্য প্রাথমিক ধাপে নিম্নবর্গের প্রানীর উপর টক্সিসিটি টেষ্ট (Toxicity Test) করতে হয়। ফার্মাকোলজি বা টক্সিকোলোজির নিয়ম অনুসারে এসব ক্রনিক টক্সিক্যাল স্টাডি ২ বছর পর্যন্ত করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তা না করেই অর্থাৎ পর্যাপ্ত ঝুঁকি নিরূপণ না করে জিএমও বেগুন চাষের অনুমোদন দেয়া হয়েছে যা দেশকে অনাকাঙ্খিত স্বাস্থ্য ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিতে পারে। (*যোবায়ের আল মাহমুদ, বিটি বেগুনের বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ করুন, সমকাল-১৮/০১/২০১৪*)

৪৪. Molecular Characterization Study

প্রতি উত্তরে বিএসআরআই এর মহাপরিচালক জিন সিকোয়েন্স পরীক্ষা খুবই ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ এবং ভোক্তার নিরাপত্তা পরীক্ষা করার মতো ল্যাব আমাদের দেশে নেই বিধায় এ ধরনের কোন পরীক্ষাই করা হয়নি বলে স্বীকার করেন।

এতো আপত্তি ও উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অজানা কোন চাপে এনসিবি ৭টি শর্ত সাপেক্ষে বিটি বেগুন মাঠ পর্যায়ে সীমিত চাষের জন্য অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে বিটি বেগুনের ১,২, ৩ ও ৪ জাত মাঠ পর্যায়ে সীমিত আকারে চাষের জন্য ৩০শে অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় হতে প্রজ্ঞাপন (নং-২২.০০.০০০.০৭৩.০৫.০০৩.২০১২-২৭১) জারির মাধ্যমে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

অনুমোদনের প্রথম শর্ত থেকে এটি স্পষ্ট যে, বার্ক, বারি এবং কৃষি মন্ত্রণালয় এক ধরনের জোর খাটিয়েই বিটি বেগুন চাষের অনুমোদন নিয়েছে। মাঠ পর্যায়ে অবমুক্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধরনের মাঠ পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা এনসিবি এবং বিসিসিকে অবহিত করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। নির্ধারিত এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ফিল্ড বায়োসেফটি কমিটি গঠনসহ বিটি বেগুন কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিটি বেগুন চাষ সংক্রান্ত নির্দেশিকা সরবরাহের কথা থাকলেও তাও করা হয়নি। এছাড়া বায়োসেফটি রুলস অনুযায়ী বিটি বেগুন বাজারজাত করার পুর্বে লেবেলিং এর বিষয়টিও মাঠ পর্যায়ে দেখা যায়নি।

প্রজ্ঞাপনের শর্তগুলো থেকেই বোঝা যায় যে বিটি বেগুন আসলেই নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে অনুমোদন প্রদানকারী সংস্থা নিশ্চিত নন। শর্তগুলো অত্যন্ত জটিল এবং কৃষক পর্যায়ে তা মেনে চলা সম্ভব হয়নি। পুরো অনুমোদন প্রক্রিয়াটি অস্বচ্ছ এবং অত্যন্ত তড়িঘড়ি করে সম্পন্ন করা হয়েছে। অনুমোদন পাবার মতো পর্যাপ্ত তথ্য না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং মুনাফা ও ব্যবসায়িক স্বার্থে বাংলাদেশের মতো জীববৈচিত্র্যপূর্ণ একটি দেশে এবং বেগুনের আদিস্থলে বিটি বেগুন অবমুক্ত করা হলো।

বিটি বেগুন চাষের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি, বাস্তবতা ও কিছু প্রশ্ন

২২ জানুয়ারি, ২০১৪ সীমিত আকারে চাষের জন্য গাজীপুর, জামালপুর, রংপুর, শেরপুর এবং ঈশ্বরদী এলাকার ২০ জন কৃষকের মধ্যে কৃষিমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে বিটি বেগুনের চারা বিতরন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সব আইন মেনেই বিটি বেগুনের গবেষণা করা হয়েছে। বিটি বেগুনের বীজ কৃষক নিজেই উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারবে এবং এতে কীটনাশকের ব্যবহার সীমিত হওয়ায় পরিবেশ দূষণ কমবে। বিটি বেগুনের চারাপ্রাপ্ত চাষীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় বিটি বেগুন চাষ করেছে এবং এ বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এবং সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেছে।

গত ৩১ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে বিটি বেগুন বিরোধী মোর্চার পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ২০ জন কৃষকের মধ্যে

চিত্র-৫: বিটি বেগুন বিরোধী মোর্চার পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ক্ষতিগ্রস্থ বিটি বেগুন চাষীরা

সূত্র: প্রান্তজনীয় যোগাযোগ গবেষণা কেন্দ্র (প্রযোগ)

চিত্র-৬: শেরপুরের লালিতাবাড়ীর পোড়াগাঁও গ্রামে কৃষকের মাঠে বিটি বেগুনের গাছ মরে গেছে

৭ জন উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা এসেছিলেন গাজীপুর, শেরপুর ও জামালপুর থেকে। সংবাদ সম্মেলনের দিন আকস্মিকভাবে হরতাল আহবান করায় দূরবর্তী রংপুর ও ঈশ্বরদী থেকে কৃষকেরা আসতে পারেননি। উপস্থিত ৭ জন কৃষক সকলেই বিটি বেগুন চাষে তাদের মারাত্নক ক্ষতির কথা জানায় এবং তারা এখনও পর্যন্ত কোন ক্ষতিপূরণ পাননি বলেও উল্লেখ করেন। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, বিটি বেগুনের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের চাষের ক্ষেত্রে মনিটরিং এর জন্য কমিটি গঠন করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, বিটি বেগুন চাষীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদানসহ নিয়ম সম্বলিত নির্দেশিকা প্রদানের শর্ত প্রজ্ঞাপনে ছিল যা সঠিকভাবে মানা হয়নি।

গাজীপুরের কৃষক হাইদুল ইসলাম বলেন, বিটি বেগুন চাষের ক্ষেত্রে কৃষকদের শুধু জানানো হয়েছে যে, এটি নতুন ধরনের বেগুনের বীজ এবং এ বীজ চাষে কোন কীটনাশক লাগবে না তাই এতে লাভবান হওয়া যাবে। প্রজ্ঞাপনের শর্ত মতে, কোন বিশেষ ধরনের সর্তকতা অবলম্বনের কথা তাদের বলা হয়নি এবং তাদের জন্য কোন বিশেষ প্রশিক্ষনের আয়োজনও করা হয়নি। মাঠ পর্যায়ের সরকারি উপজেলা কর্মকর্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি এক বিঘা জমিতে কর্মকর্তাদের দেয়া ১৫০টি বিটি বেগুনের চারা লাগিয়েছিলেন। চারা লাগানোর ১ মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসা শুরু করলেই গাছ মরে যেতে থাকে এবং সেক্ষেত্রে পুনরায় চারা দেয়া হয়। এভাবে কয়েক দফায় প্রায় ১০৫০টি করে চারা দেয়া হলেও কোন গাছই শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকেনি। গাজীপুরের অন্য কৃষকের

সূত্র: প্রান্তজনীয় যোগাযোগ গবেষণা কেন্দ্র (প্রযোগ)

চিত্র-৭: গাজীপুরের কালিগঞ্জ এলাকায় বিটি বেগুন চাষের ক্ষেতে বিটি বেগুনে পোকা দেখা যাচ্ছে

ক্ষেতে কিছু ফলন হলেও যেখানে বিটি বেগুনে ফল ও ডগা ছিদ্রকারী (FSB) পোকা শতভাগ মুক্ত থাকার কথা সেখানে শুধু পাতায় নয় ফলেও পোকা দেখা গেছে।

বেশ কিছু গাছে ফুল পচে গেছে, ব্যাকটিরিয়ার আক্রমনে পাতা কুঁকড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। পাতা ও ফলে পোকা লাগার কারণে কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে ম্যালথিয়ন, ছত্রাকনাশক কুমপ্লেক্স ও মাকড়নাশক ওমাইট ব্যবহার করা হয়েছে। এতে তাদের কায়িক শ্রম ছাড়াও ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি ও হয়রানি হয়েছে বলে উপস্থিত কৃষকেরা উল্লেখ করেন।

গাজীপুরের অন্য দুজন কৃষক মজিবুর রহমান ও মোঃ আব্দুল বাতেন একই ধরনের মন্তব্য করেন এবং ভবিষ্যতে আর বিটি বেগুনের চাষ করবেন না বলে জানান। এছাড়া শেরপুরের ৩ জন কৃষক, জামালপুরের ২জন কৃষক একই ধরনের মন্তব্য করেন এবং দেশীয় জাতের বেগুন লাগালে লাভবান হতেন বিধায় ভবিষ্যতে আর বিটি বেগুনের চারা না দেয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন।

মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন ও সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত খবর অনুযায়ী বিটি বেগুন আবাদকারী তালিকাভুক্ত ২০ জন কৃষকের মধ্যে মাত্র ২ জন কৃষক (বুরির হাট, রংপুর) ছাড়া সকলেরই আবাদ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে বিটি বেগুন আবাদকারীরা উক্ত সম্মেলনের মাধ্যমে নিজেদের হতাশা ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

কৃষকগণ ভবিষ্যতে আর বিটি বেগুন চাষ করবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

বিটি বেগুন চাষ সম্প্রসারণে বারির নতুন উদ্যোগ

কৃষকের হতাশা, ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া, অভিযোগ ও উদ্বেগকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে বিটি বেগুন চাষ সফল হয়েছে প্রচার করতে বারি ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে এক পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। আশার কথা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত মাত্র দুজন ছাড়া বাকী ১৪ জন কৃষকেরা সেখানেও বিটি বেগুনের ব্যর্থ ফলনের বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করেন[৪৫]। কৃষকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বারির কর্মকর্তা কৃষক কর্তৃক নির্দেশনা না মানাকেই ফলন ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী করেন। এতো ব্যর্থ সম্মেলনের পরেও বারির কর্মকর্তা ঘোষণা দেন যে, আসছে শীত মৌসুমে আরো ১০০ জন কৃষককে বিটি বেগুনের চারা দেয়া হবে এবং সেক্ষেত্রে ফলন ভালো হলে লেবেল ছাড়াই বিটি বেগুন বাজারজাতকরণ করা হবে।

বিটি বেগুন চাষে আর্ন্তজাতিক বিজ্ঞানীদের ও ব্যবসায়ী মহলের উদ্বেগ

বাংলাদেশে বিটি বেগুনের এ ধরণের অনুমোদন দেয়া নিয়ে আন্তর্জাতিকমহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানির সাথে যুক্ত নন এমন ১১ জন স্বাধীন বিজ্ঞানীরা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে বিটি বেগুন কৃষক পর্যায়ে চাষের যে অনুমোদন সরকার দিতে যাচ্ছে, তার সুদুরপ্রসারী পরিবেশ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বেশ কিছু বিজ্ঞানী এই বিটি বেগুন নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন যে বিটি বেগুন মানুষের খাদ্য হিসেবে মোটেই উপযুক্ত নয়। ফরাসী বিজ্ঞানী প্রফেসর জিলিস-এরিক সেরালিনি বিটি বেগুন প্রয়োগকৃত বিভিন্ন প্রানির উপর গবেষণা করে দেখেছেন যে, বেগুনের দেহে ব্যাকটিরিয়ার এই জিন এমন এক প্রোটিন তৈরি করে, যা এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধক। অর্থাৎ এ বেগুন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলে সেই প্রানীর দেহে এন্টিবায়োটিক কাজ না করার ঝুঁকি রয়েছে। এতে লিভারের সমস্যাসহ রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যাও দেখা দিতে পারে[৪৬]। ক্যালোফোনিয়ার সাল্ক ইনস্টিটিউট ফর বায়োলেজিক্যাল স্ট্যাডিজের অধ্যাপক ডেভিড সুর্বাটের মতে, বেগুনের জিনোমে বিটি টক্সিন জিন প্রতিস্থাপনের ফলে তা চারভাবে মানুষের এবং পরিবেশের ক্ষতি সাধন করতে পারে-

- বেগুনের ডিএনএ তে বিটি জিনের অনিয়ন্ত্রিত প্রতিস্থাপন;
- বিটি প্রোটিনের দ্বারা উদ্ভিদের বিপাক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন যা পটেনশিয়াল টক্সিক কেমিক্যাল বা সম্ভাব্য বিষাক্ত রাসায়নিক প্রস্তুত করতে পারে;
- বিটি প্রোটিনের সরাসরি বিষক্রিয়া; এবং
- বিটি প্রোটিন কর্তৃক এলার্জির উদ্রেক হওয়া।

জার্নাল অব হিমাটোলজি ও থ্রম্বোএম্বলিক ডিজিজ এর ২০১৩, ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত রিপোর্টে বিজ্ঞানী মিজ্জোমো দাবি করেন, জিএম বিটি টক্সিন ইঁদুরের রক্তে বিষক্রিয়া তৈরি করে, বিশেষ করে লোহিত কণিকার উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এছাড়া এসব প্রোটিন হাইপার এলার্জিক বলেও উল্লেখ করা হয়। জানুয়ারি, ২০১৪ তে প্রকাশিত ইন্ডিয়া টু'ডে প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, যেসব ইঁদুরকে বিটি বেগুন খাওয়ানো হয়েছে তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে, নারী ইঁদুরের প্রজনন অঙ্গ স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে, স্প্লীহা বড় এবং রক্তের শ্বেতকণিকা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩০-৪০% বেশি যা ইমিউন সিস্টেমের পরিবর্তন ইঙ্গিত করে।

বিটি বেগুনে আসলে কোন জিন ব্যবহার করা হয় তা নিয়েও বির্তক রয়েছে। ভারতের মাহিকো এবং বারি দাবি করছে বিটি বেগুনে শুধু Cry1Ac gene জিন ব্যবহার করেছে, যেটা সঠিক নয়। বিজ্ঞানী সেরালিনি, প্রফেসর হেইনিমেন, প্রফেসর মাঞ্জেরেকার ভারতের সুপ্রীম কোর্টে দাখিল করা প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, বিটি বেগুন শুধু Cry1Ac gene না বরং Cry1Ac এবং Cry1Ab gene এর কম্বিনেশন ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু বারি মাহিকোর টেকনোলজি ব্যবহার করেছে সেহেতু এখানকার বিটি বেগুনেও ফিউশন জিন ব্যবহার করা হতে পারে। এই ফিউশন জিন এলার্জির প্রবণতাকে যেমন বাড়িয়ে দেয় তেমনি যকৃতের ক্ষতিসাধনেরও আশংকা থাকে। বিটি টক্সিন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের জন্য ক্ষতিকর বলেও প্রমানিত হয়েছে[৪৭]।

বিটি বেগুনের চাষ ও বাজারজাতকরণের বিষয়টি বারি কর্তৃক ফলাও করে প্রচার করা হলে বাংলাদেশ অর্গানিক প্রোডাক্টস ম্যানুফ্যাক্চারস্ এ্যাসোসিয়েশন (বিওপিএমএ), বাংলাদেশ ফ্রুট, ভেজিটেবলস এন্ড এ্যালাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স এ্যাসোসিয়েশন (বিএফভিএপিইএ) সহ সমমনা সংগঠনগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ বহু আগে থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থানীয় জাতের বেগুনসহ কৃষিজ পণ্য রপ্তানিতে সুনাম অর্জন করেছে। গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি পন্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ আয় করে প্রায় ৫৩৫ মিলিয়ন ডলার এবং চলতি বছরে (২০১৩-১৪) সরকারি হিসাব অনুযায়ী এ রপ্তানী আয়ের পরিমান দাঁড়াবে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার[৪৮]। বেগুন, আলু এবং ধান এর জিএম প্রজাতির প্রচলন শুরু করলে এ বাজার বাংলাদেশ শীঘ্রই হারাবে বলে আশংকা করছে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো। "জিএম ফ্রি ক্যাম্পেইন" নামক প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হেলেনা পল গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে ইমেইলের মাধ্যমে সরকারকে অবহিত করেছেন যে, লন্ডন ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের দেশগুলো বাংলাদেশের সবজি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে শুধুমাত্র স্থানীয় জাতের শস্য উৎপাদন করে বলে তারা বাংলাদেশী কৃষিজ পণ্য ক্রয় করে থাকে; জিএমও শস্যের প্রচলন শুরু করলে বাংলাদেশের কাছ থেকে তারা অদূর ভবিষ্যতে আর কোন কৃষিজ পণ্য ক্রয় করবে না[৪৯]। অন্যদিকে অর্গানিক শস্য চাষাবাদকারী ও সবজি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিযোগ বিটি বেগুন চাষ ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে তাদের সাথে কোন ধরনের আলোচনা করা হয়নি। এই ধরনের অস্বচ্ছ ও তড়িঘড়ি অনুমোদন শুধু বির্তকিতই নয় বরং দেশের জন্য তা রীতিমত বিপদজনকও বটে।

---

৪৫. ATN Bangla, report on Bt Brinjal, 07/09/14

৪৬. Seralini Pr. Gilles-Eric, 2009, *Effects on Health and Environment of Transgenic (GM) Bt Brinjal,* University of Caen, France.

৪৭. আল মাহমুদ যোবায়ের, সমকাল, ১৮/০১/২০১৪ *"বিটি বেগুনের বাণিজ্যিক ব্যবহার বন্ধ করুন"*,

৪৮. তথ্য: আমদানি রপ্তানি ব্যুরো (২০১২-১৩, ২০১৩-১৪)

৪৯. Dhaka Tribune, 6 May, 2014

শেষ কথা

দেশের সচেতন নাগরিক ও পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে জোরালোভাবে দাবী জানিয়ে আসছিল যাতে মানুষের স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও স্থানীয় জাতের বেগুনের ওপর বিটি বেগুনের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে যেন বিটি বেগুনের অনুমোদন দেয়া না হয়। বারি কর্তৃক বিটি বেগুন চাষের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের এনসিসিবি বরাবর অনুমোদনের বিষয়টি দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হবার পরপরই "শিসউক" নামক একটি সংগঠন জুলাই মাসে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিটি বেগুন চাষের আবেদন বাতিলের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা (৯৮৪৩/২০১৩) দায়ের করে। মহামান্য হাইকোর্ট কৃষি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বারিকে তিন মাসের মধ্যে একটি কমিটি গঠন করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিষ্ঠিত কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশন (সিএসি)[৫০] এর স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বিটি বেগুন মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিনা তার একটি নিরপেক্ষ গবেষণা করার এবং গবেষণার অগ্রগতি সর্ম্পকে হাইকোর্টকে অবহিত করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে সেপ্টেম্বর মাসে "উবীনিগ" নামের আরেকটি সংগঠন একই বিষয়ে আরেকটি মামলা (৭৭১০/২০১৩) দায়ের করে। মহামান্য হাইকোর্ট পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য বিটি বেগুন ঝুঁকিপূর্ণ কিনা সে সংক্রান্ত গবেষণার প্রতিবেদন জমা দেয়ার জন্য উভয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং প্রতিবেদন প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত বিটি বেগুন অবমুক্ত সংক্রান্ত সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা থেকে বিরত থাকতেও নির্দেশ দেন। বারি এই নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল (সিএমপি-১০০০/২০১৩) করলে চেম্বার জজ ২ মাসের জন্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ স্থগিত করে দেন। ফলে আপাততের জন্য বিটি বেগুন চাষের বাঁধা থেকে রেহাই পেয়ে যায় বারি এবং এরপর তড়িঘড়ি করে অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। নভেম্বর মাসের শেষের দিকে উবীনিগ পুনরায় বিটি বেগুন চাষের অনুমোদন (প্রজ্ঞাপন) স্থগিত করার দাবি জানিয়ে মামলা (১১৯২৬/২০১৩) দায়ের করে যা এখনও শুনানীর অপেক্ষায় আছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন সরকারের দায়িত্ব হলেও এতো কিছুর পরেও সরকার বিটি বেগুনের প্রসার ঘটাতে বদ্ধ পরিকর। কেবল ১০০ জনকে নয়, বিপুল সংখ্যক কৃষকের মাঝে বিটি বেগুনের বীজ পৌঁছে দিতে সরকার এমনকি ব্যক্তিমালিকানাধীন বীজ কোম্পানিগুলোর দারস্থ হয়েছে। বিটি বেগুনের সমর্থনে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের http://wp.me/ P4F4ac-4Q, http://bt-brinjal.org দুইটি ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে। এসব ওয়েব সাইটে বিটি বেগুন বিরোধিতাকারীদের 'বিদেশী অর্থপুষ্ট' এবং 'কীটনাশক শিল্পের দোসর' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিটি বেগুনের মালিকানা ও বিতরণের দায়িত্ব বারির উল্লেখ করে http://bari.gov.bd/home/ latest_news নামে একটি ওয়েবসাইটে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিচালক দাবী করেছেন যে, ২০ জন কৃষকের কেউই বিটি বেগুন নিয়ে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। অন্যদিকে গার্ডিয়ান পত্রিকা তাদের ৫ জুন, ২০১৪ তারিখের একটি প্রতিবেদন ৯ জুন, ২০১৪ তারিখে সংশোধন করেছে। সংশোধনের মুল প্রতিপ্রাদ্য ছিল বিটি বেগুন প্রযুক্তিতে মনসান্টোর মালিকানার বিষয়টি। প্রথম প্রতিবেদনে উল্লেখ করা ছিল যে, বিটি প্রযুক্তির উপর মনসান্টোর কোন মালিকানা নেই। সংশোধিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রযুক্তির মালিক এখনও মনসান্টো, তবে এ প্রযুক্তির চারার উপর পরীক্ষা, উৎপাদন এবং তা বিতরণের লাইসেন্স বিনামূল্যে বারিকে দেয়া হয়েছে। বারি এ চারা বিতরণ করতে পারলেও বিক্রি করতে পারবে না। বিটি বেগুনের স্বপক্ষে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব ওয়েব সাইটে বিটি বেগুনের বিরোধিতাকারীদেরকে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট অ্যাখ্যা দেয়া হলেও বিটি বেগুন যে বিদেশী অর্থ এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরি সহায়তার ফসল তা বলা হয়নি।

বিটি বেগুন বিরোধিতাকারীরা বিদেশী নয়, দেশী। তাদের আন্দোলন দেশীয় বীজ রক্ষায় এবং বীজে বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশ রোধে। তাদের আন্দোলন জিএমও খাদ্য প্রযুক্তির ভ্রান্ত প্রচারণার বিরুদ্ধে। ভারত কিংবা ফিলিপাইনে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় সে দেশের পরিবেশবাদীদের এমন মানহানিকর অ্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়নি কেননা সে দেশগুলোর সরকার জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই জিএমও বেগুন নিষিদ্ধ করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার কোম্পানির পক্ষে অবস্থান নেয়ায় মনসান্টো ও কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিদেশী শক্তি দেশীয় শক্তিকে খাটো করে দেখার ধৃষ্টতা দেখায়। কৃষক সম্প্রদায় কখনই বিদেশী শক্তির এমন ভ্রান্ত প্রচার ও অপপ্রচারে বিচলিত হবে না। দেশের প্রাণশক্তি কৃষক সমাজ অবশ্যই জিএমও বেগুন প্রত্যাখান করে দেশী বেগুনই চাষ করবেন এবং কীটনাশক দমাতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণ করবেন। এদেশের আদালত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় যে অগ্রগামী ভূমিকায় আছেন তা অব্যাহত রাখতে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো অবশ্যই আদালতকে সকল সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

সূত্র: প্রান্তজনীয় যোগাযোগ গবেষণা কেন্দ্র (প্রাযোগ)

হাইদুল ইসলাম, সাইটালিয়া, শ্রীপুর, গাজীপুরের বিটি বেগুন চাষী

আমার ক্ষেতে বিটি বেগুনের চাষ করেছিলাম। মাঠ কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী চাষ করা সত্ত্বেও বিটি বেগুন গাছে ফল আসা মাত্রই অনেক গাছ মরে গেছে। যে কয়টা বেঁচে ছিল তাতে পোকা ও ব্যাকটিরিয়ার আক্রমন হওয়ায় মাঠ কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী নানা ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা সত্ত্বেও শেষ রক্ষা হয়নি। আমার অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে এবং গুণতে হয়ছে আর্থিক ক্ষতি।

ভবিষ্যতে আর বিটি বেগুন চাষ করবো না।

---

৫০. Codex Alimentarious Commissions (CAC)

CLS প্রকল্পের সহযোগিতায় **Defending Environmental Rights** -এর অধীনে এই বার্তাপত্রটি বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (**বেলা**) কর্তৃক প্রকাশিত। এই বার্তাপত্রটি প্রস্তুত করেছেন **সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান**, প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (**বেলা**)। সার্বিক সহায়তা করেছেন রেহমুনা নূরাইন, গবেষণা সহযোগী, **বেলা**।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)

বাড়ি নং ১৫এ (৫ম তলা), সড়ক নং ৩, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮-০২-৫৮৬১৪২৮৩, ৫৮৬১০৮৩১১, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮৬১২৯৫৭

E-mail: bela@bangla.net, Website: www.belabangla.org

Community Legal Services
কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস

যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত এবং ম্যাক্সওয়েল স্ট্যাম্প (পিএলসি), ব্রিটিশ কাউন্সিল ও সেন্টার ফর এফেকটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন (সিইডিআর)-এর সহযোগিতায় বেলা কর্তৃক বাস্তবায়িত